ইরানের উপর ইজরাইল-মার্কিন যৌথ হামলা

Posted on August 3, 2025 by Sushovan Dhar

ইসরায়েলের সাথে বারো দিনের যুদ্ধের আঘাতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কেঁপে উঠেছে কিন্তু ধ্বংস হয়নি। এই আক্রমণে ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেইনির প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থায় কোন বড়সড় অস্থিতিশীলতার লক্ষণও দেখা যায়নি। ইরানের ওপর প্রতিদিনের বোমা হামলায় হতাহতের সংখ্যা অনেক এবং ক্ষয়ক্ষতি ব্যপক, তবে সেখানকার পারমাণবিক কর্মসূচির অবসান ঘটেছে বলে কোন খবর পাওয়া যায় নি।

১৩ই জুন ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়া থেকে ২৪শে জুন যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত ইরান একের পর এক আঘাতের সম্মুখীন হয়। সেদেশের সামরিক নেতৃত্বের বেশ বড় অংশ সহ প্রায় ৩০ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীর প্রাণ যায় এবং ইরানের প্রধান পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে হামলা হয়। ১২ দিন ধরে ইরানের বিমানবন্দর, সামরিক ঘাঁটি, তেল শোধনাগার, একটি কারাগার, রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং আবাসিক এলাকায় বোমাবর্ষণ চলে। ইরানি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আটকাতে পারেনি। তবুও এই ইসলামী

প্রজাতন্ত্র টিকে আছে। অবশ্যই দুর্বল হয়েছে কিন্তু ইরানের শাসকদের পতন বা তাদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদের কোনও খবর নেই। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ইসরায়েলি আক্রমণে ইরানের ভারী সামরিক ক্ষতি হয়েছে এবং সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল এক ‘বড়সড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা’ যা সেদেশের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। ইসরায়েলি চরেরা ইরানে নাশকতা চালানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

ইরান ১২ ঘন্টার মধ্যে নিহত সিনিয়র সামরিক কমান্ডারদের শূন্যস্থান পূরণ করে এবং ১২ দিন ধরে দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ হানে। অবশ্যই সামরিকশাস্ত্রে ইরান বেশ উন্নত। তারা রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করেছে এবং তাদের একটি অভ্যন্তরীণ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি রয়েছে। ফলে সিরিয়া বা লেবাননের থেকে ইরানের পরিস্থিতি বেশ আলাদা। কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি দেশটির নাভিশ্বাস তুললেও ইরানের স্থানীয় শিল্পের বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে। ইরানের মোটরগাড়ি শিল্প উন্নত, ব্যবহৃত ওষুধপত্রের নব্বই শতাংশ স্বদেশে তৈরি হয়। এছাড়াও নিত্য ব্যবহার্য পণ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি শিল্পের ভাল বিকাশ ঘটেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির সারসংক্ষেপ ছিল ‘শূন্য থেকে তেল আভিভ আঘাত করা পর্যন্ত’।

ইসরায়েলের বা বিশেষ করে নেতানইয়াহুর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংস করা। তিনি বহুদিন ধরেই ইরান আক্রমণের হুমকি দিচ্ছিলেন। কিন্তু গত জুনের পরে ইসরায়েল ও ইরানের সংঘর্ষ আর পরোক্ষ সংঘাত নয়। তেল আভিভ ইরানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা বা ইরানকে নিয়ন্ত্রণ করাতেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং ইরানকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এই কাজে তাদের সর্বশেষ পদক্ষেপটি ছিল ইরানের সামরিক ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণ। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তি একটি বিপজ্জনক জুয়া।যে জুয়া ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে জায়নবাদী সরকার ইরানের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে আক্রমণের মাধ্যমে গুঁড়িয়ে

দিয়ে সার্বিক বিজয়সাধনের বাজি ধরেছিল। তার লক্ষ্য ছিল “পাসদারান” রাষ্ট্র, বিপ্লবী গার্ড এবং ইরানের মূল ক্ষমতাশক্তির উৎসের পতন। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে নাশকতা ও হুমকির মিশেলে চলতে থাকা এক পরোক্ষ যুদ্ধ সরাসরি সংঘর্ষ, মধ্য প্রাচ্যের সমগ্র ভূ-রাজনৈতিক জটিলতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া । ইসরায়েল এমন এক সীমা অতিক্রম করার পথে পা বাড়িয়েছিল যা তার নিজের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারত।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পারমাণবিক ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, কমান্ড সেন্টার ইত্যাদি। তবে তাদের সামরিক পরিকল্পনা অবিসংবাদী হলেও রাজনৈতিক কৌশলে ফাঁক ছিল। মাথায় রাখতে হবে ইসরায়েল ইরানের শাসক গোষ্ঠীকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হলে সেখানকার মোল্লাতন্ত্রের হাত শক্তিশালী করবে এবং একটি অসম, দীর্ঘ এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেবে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিরোধ, প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অটল সমর্থনের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করেছে। নেতানইয়াহুর মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ইরানকে যুদ্ধে নামিয়ে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায় নিয়ে যাওয়া যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই রণাঙ্গনে অংশগ্রহণের প্রলোভন অনিবার্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ওয়াশিংটনে বসে ডোনাল্ড ট্রাম্প খোলাখুলি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে ইসরায়েলের সামরিক সাফল্য থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। মার্কিনিরা কেবলমাত্র ইসরায়েল কৌশলগত মিত্রই নয় তারা বিভিন্ন সময়ে জায়নবাদীদের শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে মার্কিনিদের ইসরায়েলের পাশে না দাঁড়ানো তার সামরিক দুর্বলতা হিসাবে দেখা হবে। এর ফলে শি জিনপিং এবং তাঁর মতো যারা মার্কিন প্রত্যাহারের পক্ষে সওয়াল করছেন তাদের হাত শক্ত করবে।

মার্কিন আধিপত্যের গভীর সংকট মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষভাবে স্পষ্ট। এই মুহুর্তের বাস্তবতা এই যে তেল আবিব আর কেবল ওয়াশিংটনের মিত্র হিসাবে কাজ করে না বরং ক্রমশ তার রক্ষককে সে নিজে চালনা করছে। এটি সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র এবং তার মক্কেলদের ঐতিহাসিক আন্তসম্পর্কের জন্য বিপজ্জনক। ভূ- রাজনীতিতে এর অপ্রত্যাশিত প্রভাব পড়তে পারে এবং ওয়াশিংটন-এর বিশ্বব্যাপী দাদাগিরির ক্ষেত্রেও ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণেই ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে দ্বিধা প্রকাশ করেন এবং ২১ শে জুন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এক সপ্তাহ সময় নেবেন। তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তার অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং এই কথার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণ শুরু করেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই একথা বিবেচনা করেন নি যে এর ফল হিসাবে চেরনোবিলের মতো বিপর্যয় ঘটতে পারে। উপরন্তু তিনি মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বাধ্যতামূলক সম্মতি উপেক্ষা করে, এনপিটি চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং রাষ্ট্রসংঘ সনদের নীতি লঙ্ঘন করে এই উদ্বেগজনক আক্রমণটি কার্যকর করেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক সনদ লঙ্ঘনে এই কথা স্পষ্ট যে তাদের কাছে রাষ্ট্রসংঘের মূল্য আলংকারিক অর্থের বাইরে কিছু নয়। সৌভাগ্যবশত আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার পরিচালক রাফায়েল গ্রোসি মার্কিন বোমা হামলার পর তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধির কোনও লক্ষণ দেখতে পাননি। মার্কিন আক্রমণ কোনও সাফল্য অর্জন করতে না পারার ফলে চেরনোবিলের মতো একটি বিপর্যয় থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এই আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তিনি আর একবার নিজের সাথে প্রতারণা করার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী জনমতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে তাঁর বিরুদ্ধে চালিত করেছেন।

ট্রাম্পের পরমাণু কেন্দ্রে আক্রমণের ফলে ইরানি সংসদ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার পক্ষে ভোট দেয় যে পথ দিয়ে বিশ্বের ব্যবহার্য তেলের ২০% পরিবাহিত হয়। ট্রাম্প ধারাবাহিকভাবে দাবি করেন যে আমেরিকা এই যুদ্ধে সামনের সারিতে

নেই। তার কথাগুলিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বাস্তবে নেতানিয়াহু এবং মার্কিন দেশের জায়োনিস্ট লবি ট্রাম্পকে তিনটি কেন্দ্রের উপর হামলায় অংশ নিতে বাধ্য করেছিল যে ধরনের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভোট চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নেতানিয়াহুর প্রতি ক্ষোভের ভান করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া এই ভয় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও চীন তার রণাঙ্গনে অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে পারে ।

একটি দীর্ঘ যুদ্ধ ও অনিশ্চিত বিজয়

১৯৭৩ সালের ইওম কিপপুর যুদ্ধ থেকে ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত ইসরায়েলি ভাবনাচিন্তা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এড়ানোর পক্ষে ছিল। এই কৌশলের অংশ হিসাবে ফিলিস্তিনিদের থেকে শুরু করে তারা শত্রুদের বিভক্ত করতে থাকেন। এই স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসাবে ১৯৮০-এর দশকে ফাতাহ সমর্থক এবং ইয়াসির আরাফাতের বিরুদ্ধে হামাসকে তোল্লা দেওয়া শুরু করে সাম্প্রতিককালে হামাসের বিরুদ্ধে গাজায় অন্যান্য ইসলামিক শক্তিগুলিকে মদত দেওয়া চলতে থাকে। গাজায় বিভিন্ন সামরিক অভিযানকে নির্দিষ্ট করা হয় – কৌশলগত, খণ্ডিত এবং সীমিত সময়ের অভিযান হিসাবে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এই অভিযানগুলিকে “লনের ঘাস ছাঁটাই” বলে অভিহিত করে। কিন্তু, এই যুক্তি এখন ধোপে টিকছে না। ইসরায়েল রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক ফ্রন্টে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। শত্রুকে বিভক্ত করা থেকে তাকে নির্মূল করার লক্ষ্যে মনোনিবেশ করছে। তা সত্ত্বেও, এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার ফলে এই দ্বন্দ্ব ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য একটি স্ব-ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিতে পরিণত হতে পারে।

জায়নবাদী এই রাষ্ট্রটি ধারাবাহিকভাবে প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করার ক্ষমতা দেখিয়েছে। তবে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিছক আরেকটি অভিযান নয়; এটি তার নিজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভিযানের ব্যর্থতা তাকে

অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ দেবে না। নেতানিয়াহু এই মুহুর্তে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছেন। তিনি ইহুদি “বাসস্থান” সম্প্রসারণের অভিপ্রায় নিয়ে গাজায় সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া অব্যহত রেখেছেন। বৃহত্তর ইসরায়েল হিসাবে দাবি করা অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনিদের (মহিলা ও শিশু সহ) বহিষ্কার এবং পদ্ধতিমাফিক নির্মূল করার মিশন জারি রেখেছেন। এই গণহত্যা কর্মসূচী সম্পাদনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এখন এক কৌশলগত বিজয় নিশ্চিত করার জন্য “মহা শয়তান “ ইরানকে আত্মসমর্পণে করতে বাধ্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হয়। এই ধরনের বিজয় তাকে দখলকৃত অঞ্চলে ফিলিস্তিনি জনগণের পর্যায়ক্রমিক খুন, বহিস্করণ ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের লাগাতার অভিযান চালিয়ে যেতে দেবে।

কোন বিকল্প রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ফলাফল কেবলমাত্র ইস্রায়েলের পরাজয়ের সূচনা করবে না,তা সম্ভবত এই ইহুদিবাদী শক্তির – কিছু ক্ষেত্রে গভীরভাবে গেঁথে থাকা – সম্প্রসারণবাদী জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের সমাপ্তির সূচনা করবে। সেই পরিণতি এই হিব্রু রাষ্ট্রের জন্য একটি মারাত্মক সংকটের সূত্রপাত করতে পারে। ক্ষমতার মুখোশের আড়ালে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু একটি নিষ্ঠুর প্রতি-বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আজ অবধি অন্য কোনও জায়োনিস্ট নেতার চেয়ে বেশি। তার মরিয়া কৌশল ইস্রায়েলকে তার বেঁচে থাকার নামে সমস্ত নৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক সীমানা লঙ্ঘন করার উদ্দীপনা যোগাচ্ছে। গাজায় কুড়ি মাস ধরে গণহত্যা চালানোর পর ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত সমস্যার নাকি কোন সমাধান হয়নি । অন্যদিকে, এই গণহত্যা ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং বিশ্বজুড়ে ইহুদি সম্প্রদায়গুলিকে বিপদে ফেলেছে যাদের এই অন্যায্য ইহুদিবাদী প্রকল্পের প্রতি কোন সমর্থন নেই। অনেক দেশ ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের একঘরে করার বিষয়ে আলোচনা করছেন। শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোনের চেয়েও বেশি, এই অত্যধিক যুদ্ধবাজ নীতিই শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারে।

আয়াতুল্লাহর শাসন ১৯৭৯ সালে ইরানের শাহের বিরুদ্ধে ইরানি বিপ্লবের সহিংস দমন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইরানের নারী, যুবক, শ্রমিক সহ সমস্ত জনগণ এই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বারবার ক্ষোভে-বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন। এই জমে থাকা ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইরানিদের “অশুভ ও নিপীড়নমূলক শাসনের” বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ডাক দিয়েছিলেন। যাইহোক, নেতানিয়াহুর উদ্দেশ্য এই মোল্লাতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃত্ব থেকে জনগণকে মুক্ত করা নয়। ইসরায়েলও কার্যত একটি ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্র। তার লক্ষ্য ছিল ইরান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অবলুপ্ত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুতুল দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা, যেমনটি ২০ শতক জুড়ে (১৯৭৯ সাল পর্যন্ত) ছিল। লক্ষ্যটিকে ট্রাম্প এবং মার্কিন নব্য-রক্ষণশীলরা যে হৈহৈ করে সমর্থন করবেন সে কথা বলা বাহুল্য। গত শতকের মার্কিন দেশের তাঁবেদার এই তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে মার্কিনিরা তার আগের অবস্থাতে ফিরে পেতে চাইবেন এতে আর অসুবিধা কী!

ইসলামী প্রজাতন্ত্র অবশ্যই তার জনভিত্তি হারিয়েছে। কিন্তু অনেক বিশ্লেষক করেন তা হল ইরানি জাতীয়তাবাদের গভীরতার অবমূল্যায়ন করেন । এমনকি যারা বর্তমান সরকারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তারাও এই আদর্শের শরিক। পশ্চিমের প্রতি একটি নির্দিষ্ট বিদ্বেষের সাথে সাথে ঐতিহাসিকভাবে নিহিত এই অনুভূতিটি এখনও বেশ শক্তিশালী। অতএব নেতানিয়াহুর এই অভিযান ইরানে নতুন করে জাতীয়তাবাদী ঢেউ তুলতে পারে। তবে এই প্রতিক্রিয়া ইরান-ইরাক যুদ্ধের (১৯৮০-৮৮) সময় যেমন ঘটেছিল তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইসরায়েলের আক্রমণের মুখে ইরানে মোল্লাতন্ত্রকে হঠিয়ে সামরিক শাসন জারি হয়ার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে, নেতানিয়াহু একথা বিলক্ষণ বোঝেন তাই তার লক্ষ্য ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ইরানের সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও গভীর করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল গৃহযুদ্ধকে উস্কে দেওয়া যা ২০০৩ সালে ব্যর্থ ইরাক আক্রমণের পর আমেরিকানদের উস্কে দেওয়া পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইরানের জনগণের প্রকৃত মুক্তি কখনোই জাতিবাদী আগ্রাসী ইসরায়েলের রক্তাক্ত ও সহিংস হাত ধরে আসবে না, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি বা পরোক্ষ সমর্থন থেকেও আসবে না। পারমাণবিক অস্ত্র ভীষণ বিপজ্জনক এবং আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে হবে কিন্তু এই বিষয়ে ইরানকে শাসন করার কোন অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল বা ফ্রান্সসহ কোনো পারমাণবিক দেশের নেই।

আমরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির জনগণ এবং অন্যান্য সকলকে আহ্বান জানাতে পারি —এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও তার সহযোগীদের সঙ্গে যে কোনো ধরণের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করতে, ইরানের উপর আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞাকে নিন্দা জানাতে, এবং আয়াতোল্লাদের শাসনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ইরানকে রক্ষা করতে। ইরানি জনগণের জন্য, এই পথটিই একমাত্র পথ– নিজেরা সংগঠিত হয়ে এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে ১৯৭৮–১৯৭৯ সালের বিপ্লবের শুরা বা কাউন্সিল ভিত্তিক অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করা ও শ্রমিক শ্রেণির একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের পরিস্থিতি তৈরি করা।

আজকের অস্থির মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন ইরানি বিপ্লব গোটা অঞ্চলজুড়ে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং দীর্ঘদিনের যন্ত্রণার, বিশেষত নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের কষ্টের, অবসান ঘটাতে পারে।

এই সংঘর্ষ ও নতুন উত্তেজনা

ট্রাম্প তাঁর হামলার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন “ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত রাখার প্রয়াস” হিসেবে। তিনি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ জানান, যা স্পষ্ট করে দেয়—ইসরায়েল এই সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা রেখেছে।

এই পদক্ষেপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুসারী রাষ্ট্রের মধ্যে ভূমিকা

বিনিময়ের ইঙ্গিত দেয়, যার ভবিষ্যত প্রভাব গভীর ও জটিল। তবে এর প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও পড়তে পারে। যদি ইরান জোরালোভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এর খেসারত জনজীবনে পড়ে, তাহলে মার্কিন জনমত ইসরায়েলের বিপক্ষে যেতে পারে।

এই হামলা কেবল ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির মোড় ঘুরিয়ে দিল না, বরং বিশ্ব নিরাপত্তা কাঠামোর ওপরও স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। এখন আর আন্তর্জাতিক চুক্তি বা কূটনীতি নয়, বরং আগাম ও ভয়াবহ হামলার ক্ষমতাই যেন নতুন বাস্তবতা।

ইরানের সামনে দুই পথ: আত্মসমর্পণ বা ধ্বংস। এমনকি যদি তারা সংযত থাকে, তাহলেও তাদের মনে হবে—পারমাণবিক অস্ত্র না থাকা ছিল একটি কৌশলগত ভুল।

পিয়ংইয়ং, ইসলামাবাদ, বেইজিং, মস্কো—সবাই এখন বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশ্ব এখন জানে, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অনুমতি বা আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়াই এমন অভিযান চালাতে পারে।

অর্থাৎ, ট্রাম্প কেবল ইরানকে বোমা মারেননি, বরং একটি ভঙ্গুর বৈশ্বিক ভারসাম্যকেও উড়িয়ে দিয়েছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ ও ফিলিস্তিনে গণহত্যার পরে এই ঘটনাও প্রমাণ করে—আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি এক যুদ্ধ, সংকট ও বিপ্লবঘন যুগে, যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নেতারা বাস্তবতা বুঝে উঠার আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে মৌলিক কৌশলগত প্রশ্ন হলো—চীনা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের আবহে কীভাবে নিজের শোষণমূলক আধিপত্য টিকিয়ে রাখা যায়? ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি যে পথ বেছে নিচ্ছেন, তা বাইরে থেকে নতুন মনে হলেও, তা মূলত বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা বিভাজনের একটি আপোষমূলক কৌশল: রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে একটি সমঝোতার চেষ্টা।

এই কৌশলের সারাংশ: “আমেরিকা শুধু আমেরিকানদের জন্য”—এর অন্তর্ভুক্ত ল্যাটিন আমেরিকা, সেন্ট্রাল আমেরিকা, কানাডা এমনকি গ্রিনল্যান্ডও। ইউক্রেন থাকবে রাশিয়ার আওতায়। একইসঙ্গে চীনের সঙ্গে তাইওয়ান নিয়ে সম্ভাব্য আলোচনার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের সখ্যতা, ইউক্রেন ইস্যুতে মার্কিনী প্রত্যাহার— বিনিময়ে ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ শোষণের সুযোগ প্রাপ্তি—এবং বিভিন্ন ভূ- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় “মিত্র” সাম্রাজ্যবাদগুলোর ক্রমাগত প্রান্তিকতা এই নতুন কৌশলের অংশ। তবে এই কৌশলের লক্ষ্য শান্তি নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী লুটের মাল ভাগ করে নেওয়া।

আমরা জানি না তিনি এতে সফল হবেন কি না, কিন্তু আমরা জানি তিনি কী ধরনের মানুষ।

ইরান শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে তাদের চূড়ান্ত শত্রু হিসেবে ঘোষণা করলেও, বাস্তবে এই দুই দেশের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া বরাবরই দুর্বলতা ও দ্বিধার পরিচয় দিয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তেহরানের ওয়াশিংটনের প্রতি আচরণ থেকে। তারা ঘোষণা করেছিল, যদি ইসরায়েল ইরানের ওপর আগ্রাসন চালায়, তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রকেও দায়ী করবে এবং প্রতিশোধে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক স্বার্থকেও লক্ষ্যবস্তু করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, যখন ইসরায়েল আগ্রাসন বাড়িয়েছে—ইরানের পারমাণবিক ও সামরিক ক্ষমতার একটি বড় অংশ ধ্বংস করেছে এবং বহু সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে, যারা পারমাণবিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তখন তেহরান একটি গুলিও চালায়নি উপসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কোনো মার্কিন ঘাঁটির দিকে, এমনকি তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের দিয়েও এসব ঘাঁটি বা যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে কোনো হামলা বা হুমকি দেয়নি।

যখন ট্রাম্প তার মিত্র বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার ইঙ্গিত দেন, তখনও তেহরান বলেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া হবে ব্যাপক। কিন্তু এবারও হুথিদের হুমকি কার্যকর কোনো পদক্ষেপে পরিণত হয়নি; বরং তা একটি ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের শুরুর বছরগুলোর আচরণের সঙ্গে সাম্প্রতিক বছরগুলোর আচরণের পার্থক্যটি স্পষ্ট—যেখানে শুরুতে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে সত্যিকারের চাপের মুখে ফেলেছিল, আর এখন তারা সিরিয়ায় তাদের বাহিনীর ওপর ধারাবাহিক ইসরায়েলি হামলার জবাবে কোনো কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ।

এই ধারা শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের শুরুতে ইরাকে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম দফার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধের ঘটনায়, যখন তেহরান আগেই বাগদাদের মাধ্যমে মার্কিন বাহিনীকে সতর্ক করেছিল। এর ফলে আইন আল-আসাদ বিমানঘাঁটিতে বিস্ফোরণের শব্দে কিছু মার্কিন সৈন্য মানসিক আঘাতে আক্রান্ত হলেও কোনো প্রাণহানি হয়নি।

ইরানি শাসকগোষ্ঠীর প্রাথমিক সময়ের আচরণ আর সাম্প্রতিক বছরের আচরণের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হলো—একটি শক্তিশালী জনসমর্থনপুষ্ট শাসনের সঙ্গে বর্তমান শাসনের পার্থক্য, যা এখন তৎকালীন জনসমর্থন হারিয়েছে এবং নিজ সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে।

ইসরায়েলি বোমা হামলা ও ব্যাপক ধ্বংসের ফলে ইরান সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইসরায়েল কর্তৃক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, আইআরজিসি নেতৃবৃন্দ এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের হত্যাকাণ্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ইরানের শাসনব্যবস্থায় ইসরায়েলি অনুপ্রবেশ কতটা গভীর। যদিও ইরান এখনো ইরাক, লেবানন এবং ইয়েমেনে নিজেদের প্রতিনিধিদের (প্রক্সি) মাধ্যমে প্রভাব বজায় রেখেছে, তারা এখনো হরমুজ প্রণালী অবরোধ বা মাইন বসিয়ে তেল ও গ্যাসবাহী ট্যাংকারগুলোর চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে

সক্ষম—বিশেষত এশিয়ার দিকে যাওয়া জাহাজগুলোর ক্ষেত্রে।

রাশিয়া ও চীন দীর্ঘদিন ধরেই ইরানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। তবে দেশের অভ্যন্তরে অন্তত ৮০% জনগণ বর্তমান শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করে, যাকে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত, শোষণমূলক ও সামরিকীকৃত মনে করে—একটি সরকার, যেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কল্যাণের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না এবং যাদের অনেকেই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। এখন ইরানের বড় একটি অংশ ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের পক্ষে মত দিচ্ছে এবং ধর্মীয় মৌলবাদভিত্তিক শাসনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

সরকার বিরাট শোকসভা ও জনসমাবেশের আয়োজন করে জনগণের সমর্থনের ভ্রান্ত ধারণা তৈরির চেষ্টা করছে, কিন্তু বাস্তবে এদের সমর্থকদের সংখ্যা ২০% এর বেশি নয়। চলমান জল সংকট, বাড়িভাড়া ও খাদ্যের দাম নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে সরকার ৭০০-রও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের ‘ইসরায়েলের গুপ্তচর’ বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এই সাম্প্রতিক হামলার তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে শ্রমিক অধিকার, নারী অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং ছাত্র আন্দোলনের ওপর দমন-পীড়ন আরও বেড়ে গেছে—যারা ইরানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে চলেছে।

ইরানে বামপন্থীরা বর্তমানে দুর্বল, বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর তুদে পার্টি খোমেইনি ও ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করায় তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে “নারী, জীবন, স্বাধীনতা” আন্দোলন শ্রমিক ও নারীদের সংগ্রামকে সমর্থন করে, আর তরুণ প্রজন্ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখনো বামপন্থী ধারণা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

অগ্রগামী শক্তিগুলোর মধ্যে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী নারগিস মোহাম্মদি ও শিরিন এবাদি, এবং একাধিক ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলমান যুদ্ধে ইসরায়েল/যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান—উভয় পক্ষের নীতিকে নিন্দা করেছেন। শ্রমিক ও লেখকদের বিভিন্ন সংগঠনও সকল সংশ্লিষ্ট শক্তিকে সমানভাবে দায়ী করে নিন্দা জানিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীলদের পক্ষে চলমান সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রকৃত নৈতিক অবস্থান গ্রহণের অর্থ —সব পক্ষের সামরিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, কর্তৃত্ববাদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরোধিতা করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং যুদ্ধ ও দমন-পীড়নের রাজনীতির মূল কাঠামোর বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়। সত্যিকারের প্রগতিশীলতার অর্থ —ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান বা অন্য যে শক্তিই হোক না কেন, দমন, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত কাজ করলে, স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তার প্রতিবাদ করা।

প্রবন্ধটি অনীক পত্রিকার জুলাই ২০২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত

About the Author

Sushovan Dhar
Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

View All Posts

Sushovan Dhar

+ posts

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint